ধা রা বা হি ক

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে স্বামীজীর শেষ উপস্থিতি ১৯০২ সালে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : ''আজ ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) মহামহোৎসব—যে উৎসব স্বামীজী (বিবেকানন্দ) শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের পরের আষাঢ় মাসের ২০শে তারিখে রাত্রি ৯টা আন্দাজ, তিনি স্বরূপসম্বরণ করিয়াছিলেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

''স্বামীজী বলিলেন, 'লোকের গুলতান (উৎসবের লোক-সমাগম) দেখে কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক। আর, নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে—কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।' শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দও সকল কার্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া ও হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

''স্বামীজী। আমার মনে হয়, এরূপভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্যভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন—হয়তো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন—হয়তো বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন—হয়তো Question-Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পর দিন—চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল। দুর্গাপূজা যেমন চারদিন ধরে হয়—তেমনি। ঐরূপে উৎসব করলে শেষদিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতান হলেই যে ঠাকুরের মত খুব প্রচার হল, তা তো নয়।

''শিষ্য। মহাশয়, আপনার উহা সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

''স্বামীজী। আর বাবা, ও সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ওসব করিস।

''শিষ্য। মহাশয়, এবার অনেক দল কীর্তন

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস, আমেরিকা

আসিয়াছে।

''ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণ্য ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

''এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এসেছে?' স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, 'ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর দু-চারজন ইংরেজ মহিলা।' শিষ্য স্বামীজীকে ঐ কথা বলায় স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ আলখাল্লাটা দে তো।' শিষ্য উহা তাঁহাকে আনিয়া দিলে তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য ভব্য হইয়া বসিলেন ও শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামীজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখছিস, এরা কেমন সভ্য? বাঙ্গালী হলে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।' শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

''বেলা প্রায় ২॥০টা। লোকের মহা ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্তন, কত প্রসাদ বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই। স্বামীজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, 'একবার নয় দেখে আয়—খুব শীগ্‌গির আসবি কিন্তু।' শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

''দশ মিনিট আন্দাজ বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

''স্বামীজী। কত লোক হবে?

''শিষ্য। পঞ্চাশ হাজার।

''শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, 'বড় জোর ৩০ হাজার।'

''উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥০ টার সময় স্বামীজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।''[৮৪]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৯০৩

১৯০২ সালে স্বামীজীর তিরোধানের পর সঙ্ঘ তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে শুরু করল। তিনি তাঁর গুরুর এই ধর্মসঙ্ঘকে এমন দুর্নিবার শক্তি দিয়ে গতিশীল করে গেছেন—যা ১৫০০ বছর (স্বামীজীর নিজের কথায়) কোনও বিরুদ্ধ শক্তি রুখতে পারবে না। স্বামীজী বলেছিলেন, ''এমনও হতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝব—এই দেহের বাইরে চলে যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের মতো ফেলে দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোনদিন কর্ম হতে ক্ষান্ত হব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে থাকব।''[৮৫]

১৯০৩ সালে বেলুড় মঠে ঠাকুরের উৎসব হল। উদ্বোধনের ৫ বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হল : ''যাঁহার বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রভাব আজ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, যাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মধুর বাণী আজ সমগ্র জগৎকে দ্বেষ হিংসা ভুলাইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর করিতেছে, যাঁহার অপূর্ব্ব কাম কাঞ্চন ত্যাগ, আধুনিক বিজ্ঞানদর্পিত ইহজীবনসর্ব্বস্ব ইউরোপ আমেরিকাকেও চমকিত করিয়াছে এবং সমগ্র জগতেরই যেন হাওয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, যাঁহার

অপূর্ব্ব উপদেশ শুনিবার জন্য আজ সমগ্র জগৎ আগ্রহান্বিত, সেই ভগবান শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শুভ সপ্ততিতম জন্মোৎসব গত ২৪শে ফাল্গুন বেলুড় মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। আজ আবার বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন নরনারী,—সাধু, অসাধু, সাধক, লম্পট, ধর্ম্মাত্মা, পাপী সকলেই প্রাণ ভরিয়া এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। যাঁহাদের অন্য সময় পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অল্প, সেই সকল ভক্তবৃন্দের পরস্পর সাক্ষাৎ ও সাদর সম্ভাষণ হইল। মধুর মাতৃনামের সঙ্গীতে দিগ্‌দিগন্ত পুরিল। হরিনামের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রমাগত প্রসাদ বিতরণে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিল।"

১৮৮১ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই নিবন্ধে পরিবেশিত হল। এরপর দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং সঙ্ঘ বহির্ভূত বহু কেন্দ্রে ঠাকুরের জন্মোৎসব ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতে শুরু করল।

সেই ট্র্যাডিশন সমানেই চলেছে।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজার উৎসব প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী চলে। ভোর সাড়ে চারটেয় মঙ্গলারতি থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান—বেদপাঠ ও স্তবগান, ঊষাকীর্তন, ঠাকুরের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম, শ্রীরামকৃষ্ণগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্যামাগীতি, লীলাগীতি, ধর্মসভা, সন্ধ্যারতি, সারারাত কালীপূজা, শেষরাতে বিরজা হোম ও সন্ন্যাসদীক্ষা এবং পরিশেষে মঙ্গলারতি। তিথিপূজার দিন দুপুরে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ব্যক্তি খিচুড়ি প্রসাদ পান।

পরবর্তী রবিবার অনুষ্ঠিত হয় public festival (সাধারণ উৎসব)। ওইদিন বেলুড় মঠের সব মন্দির ও গেট খোলা থাকে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে মেলা বসে। লক্ষাধিক লোকসমাগম হয়। হাজার হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর থেকে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান চলতে থাকে মঠের বিভিন্ন প্রান্তে—বেদপাঠ, ভজন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ, প্রভাতী কীর্তন, কবিগান, লালনগীতি, ভক্তিগীতি, শ্যামাসংগীত, গীতি-আলেখ্য, রামায়ণ গান, কালীকীর্তন, নাটক, লোকনৃত্য এবং পরিশেষে fire works (আতসবাজি পোড়ানো)। গঙ্গার এপার-ওপার ও গঙ্গাবক্ষ থেকে লোকে বাজি-পোড়ানো দেখে আনন্দ পায়। মঠপ্রাঙ্গণে শিল্পীরা তাদের শিল্পসম্ভার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পণ্য বিক্রি করে। ওইদিন ঠাকুর বিশ্রাম না করে সারাদিন তাঁর অগণিত ভক্তদের দর্শন দেন ও আনন্দ দান করেন।

প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তেরো পার্বণের উল্লেখ আছে। কিন্তু পঞ্জিকার পাতায় পাতায় দেখা যায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-পার্বণ, মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের তালিকা, শুভদিনের নির্ঘণ্ট প্রভৃতি। এসব দৃষ্টে মনে হয় বারো মাসে নয়, প্রতি মাসে তেরো পার্বণ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আবির্ভাব উদ্‌যাপিত হয়, তিরোভাব নয়। আমরা ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করি, তিরোভাব বা অন্তর্ধান নয়। কারণ ঠাকুর আমাদের কাছে চির বিদ্যমান। পাণ্ডবগীতায় আছে—"নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।/ যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥"—যারা হৃদয়ে মঙ্গলময় ভগবান হরিকে বহন করে, তারা নিত্য উৎসবে আনন্দ পায় ও সদা শ্রী ও মঙ্গলের অধিকারী হয়।

উৎসবের উৎস, প্রাণ ও লক্ষ্য আনন্দ। এ-আনন্দ একা ভোগ করে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যা পাই তা দশ জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন

আনন্দময় পুরুষ। তিনি এ-পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে দিব্যানন্দ দান করতে। তাই তাঁর জন্মদিনে আমরা উৎসবের আনন্দে মেতে উঠি। বেলুড় মঠের উৎসবের তালিকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেখানে যেন উৎসব লেগেই আছে।

কালচক্র কখনও থেমে যায় না। ১৯৩৬-৩৭ সালে শুরু হল বর্ষব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব। বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও সঙ্ঘ বহির্ভূত বহু কেন্দ্রে ঠাকুরের একশততম জন্মোৎসব ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতে শুরু করল। বিশ্বের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন। তাঁদের সব ভাষণ ও লিখিত বিবৃতি 'The Religions of the World' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে 'The Cultural Heritage of India' নামে বিশাল গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ওই গ্রন্থ আট খণ্ডে ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী জন্মোৎসবকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রশস্তি নিবেদন করেন :

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব
বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

১৯৩৬-৩৭ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। অবতার যখন মানুষ হয়ে আসেন তখন চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা বইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলার সাক্ষী তখন অল্প কয়েকজন বেঁচে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও সন্ন্যাসিনী গৌরীমা জীবিত ছিলেন। এঁদের উপস্থিতি ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবকে জীবন্ত করে তুলেছিল।

অনেকে রাম ও কৃষ্ণের জীবনকাহিনিকে myth বা পৌরাণিক, অবাস্তব বলে মনে করে এবং তাঁদের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু আজ থেকে হাজার বছর পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কারণ—ক্যামেরায় তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগুলি, শ্রীম-র ডায়েরিতে লিখিত বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি, স্থান, ব্যক্তিগণ সমেত শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন ও প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অভেদানন্দের কণ্ঠস্বর। ঠাকুরের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিও স্বামী অভেদানন্দের একটি বাংলা ভাষণ 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য' বেতারে ঘোষণা করে এবং সেটি গ্রামোফোন রেকর্ডে রেকর্ড করা হয়। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের কণ্ঠস্বর একটি ঐতিহাসিক দলিল। ওই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটির অনুলিপি পাঠকবর্গকে প্রদান করে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত' নামক দীর্ঘ নিবন্ধ শেষ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য জড়বাদের বন্যা সারা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব সমগ্র হিন্দুসমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছিল, তখনই ধর্মগ্লানি দূর করিয়া সনাতন ধারাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন এই বিশ্বে হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের সুদূর এক পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও নিরক্ষর সাধারণ মানুষের বেশে সনাতন অক্ষরব্রহ্মের অনুভূতির দ্বারা অসাধারণ

মহামানবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের তর্কজাল তাঁহার মধ্যে ছিল না। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষায় তাঁহার বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু এমনই ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ও দিব্য অনুভূতি যে, সকল সমস্যার সমাধানই তিনি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন মানুষের রুচি কখনও এক হইতে পারে না, বৈচিত্র্যের মাঝে বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সকলকে রক্ষা করিয়া সকলের সমান পূজা দিয়া সত্যানুভূতির আলোকে তিনি প্রচার করিলেন—'যত মত তত পথ'। সকল ধর্মই সত্য। আচার্য শঙ্করের মতবাদ দিয়া তিনি রামানুজ বা মধ্বকে খণ্ডন করিলেন না। বুদ্ধকে দিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে অথবা হিন্দুধর্মকে দিয়া খ্রিস্টান বা ইসলামকে ও শাক্তকে দিয়া শৈবকে তিনি নিরস্ত করিলেন না, কিন্তু সকলকেই সত্য বলিয়া, যুক্তির এক-একটি পন্থা বা উপায়স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি একত্বের মিলনমন্ত্র বিতরণ করিয়া গেলেন।

সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্বধর্মান্ সমাচরন্।
ধর্মমাত্রস্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতম্॥

কী অদ্ভুতই না ছিল তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন! যে-অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া মানুষ পার্থিব ভোগসুখের মাঝে আপনাকে বিলাইয়া দেয়, সে-অর্থকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন তুচ্ছ মাটির সহিত তুলনা করিয়া। আমরা দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের বাগানেও তাঁহাকে দেখিয়াছি কোনো ধাতুদ্রব্যই তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তাহার পর সর্বগুণে বিভূষিতা স্বীয় পত্নী সারদাদেবীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, নারীমাত্রেই ছিল তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্নীকে দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমে গুরুত্বে বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চাসন প্রদানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের বলিয়াছিলেন—যিনি রামচন্দ্র ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার ছবি দেখাইয়া আরও বলিয়াছিলেন—এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।

বাস্তবিক এত অল্পদিনের মধ্যে এই দৈববাণীর যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পরিশেষে ইহাই বলিতে হয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন এবার বস্তুর আবরণে পূর্ব পূর্ব অবতারগণের ভাবসমষ্টির প্রতীক হইয়া সমন্বয়-অবতাররূপে। তাই সকল ধর্মকে সমন্বয়ের মাল্যে গ্রথিত করিয়া তিনি সনাতন ধর্মের মহিমা আরও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আর সেই মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অভিজাত ও পতিত ক্রমশ সেই মহান উদারতার দিকে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নির্বন্ধ শান্তিময় বাণীর পাদপীঠে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও চণ্ডাল সকলে নির্বিবাদে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। সকলকে সখ্যতা ও একতা সূত্রের মাঝে মঙ্গল ও শান্তি বিতরণ করিয়া ইহা বহুকাল ধরণীর বক্ষে বর্তমান থাকিবে।

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃত-বিগ্রহং বৈ/ ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"[৮৬]

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

৮৪। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৮, উত্তর কাণ্ড, পৃঃ ১৪৯-৫৮
৮৫। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ১০, ১৯৭৩, পৃঃ ৩২৫
৮৬। স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ ও স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ সম্পাদিত, *স্বামী অভেদানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯, পৃঃ ২৯৩-৯৪